**ATMADEEP**

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1272-1281
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.130**

# ‘কবিতা’ পত্রিকার যাত্রা: বুদ্ধদেব বসুর স্বপ্ন ও বাস্তবতার এক বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

**শম্ভু ভূষণ লস্কর**, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম, ভারত*

Received: 14.05.2025; Send for Revised: 17.05.2025; Revised Received: 17.05.2025; Accepted: 28.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Abstract

Bengali literature has been enriched in various ways by different literary periodicals. In the twentieth century, the role of periodicals in the practice and development of Bengali literature was immense. Sabujpatra, Kallol, Kali-Kalam, Pragati, and Porichoy played significant roles in shaping the course of Bengali literature and contributed to its enrichment in many ways. Yet, why did Buddhadeva Bose feel the need to publish a distinct literary magazine named Kobita? In this essay, we will attempt to explore that question.

**Keywords:** Buddhadeb Bose, Kobita Literary Magazine, History and Significance

১৯১৪ সালে প্রকাশিত ‘সবুজপত্র’ বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে স্বতন্ত্র একটি পত্রিকা। প্রমথ চৌধুরী বাংলা চলিত গদ্যকে ব্যবহার করে দেখালেন, যেকোন বিষয়েই চলিত গদ্য ব্যবহার করে সাহিত্য রচনা করা যায়। তাছাড়া বাঙালি লেখকেরা যাতে সাধুভাষা বর্জন করে চলিত ভাষাকে গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য বদল ঘটালেন। অর্থাৎ ‘‘সবুজ পত্র বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রয়োগে যে-পথ নির্দেশ করেছিল, সে পথে রবীন্দ্রনাথ চলেছিলেন প্রমথবাবুর অনুসরণে। এখানে পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়: বচনটি সার্থক হয়েছিল।’’[১] বুদ্ধদেব বলেছিলেন– ‘‘সবুজ পত্র বাংলা ভাষার প্রথম লিটল ম্যাগাজিন।’’[২] এই কথাকে প্রমাণ করতে তিনি লিটল ম্যাগাজিনের স্বধর্মকে বর্ণনা করেছিলেন এভাবে ম্যাগাজিন নামেই যখন প্রতিবাদ, তখন রূপে ও ব্যবহারেও তা থাকা চাই-আর সেটা শুধু একজন অধিনায়কেরই নয়, একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর। ‘‘‘সবুজপত্র’এ এই লক্ষণ পুরোমাত্রায় বর্তেছিলো। তাতে বিদ্রোহ ছিলো, যুদ্ধ-ঘোষণা ছিলো, ছিলো গোষ্ঠীগত সৌষম্য।’’[৩] তাছাড়া বুদ্ধদেব বসুর মতে, সবুজপত্রের প্রথম দান প্রমথ চৌধুরী বা বীরবল, দ্বিতীয় দান চলতি ভাষার প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় দান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বুদ্ধদেবের ভাষায়-

> ‘‘‘প্রমথ চৌধুরী আর রবীন্দ্রনাথ-এ’দুজনের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিলো ‘সবুজপত্রে’; প্রথম জনের আত্মপ্রকাশের জন্য, দ্বিতীয় জনের নতুন হবার জন্য। প্রচলিত অন্য কোনো পত্রিকায়, অন্য কোনো সম্পাদকের আশ্রয়ে প্রমথ চৌধুরীর স্বকীয়তার বিকাশ হতে পারতো না; তাছাড়া শুধু রচনাতেই নয়, সম্পাদনাতেও তিনি ছিলেন প্রতিভাবান।’’[৪]

রবীন্দ্রনাথ ‘সবুজপত্রে’র কাছে পেয়েছিলেন পুরোনো অভ্যেসের বেড়ি ভাঙার সাহস, যৌবনের স্পর্শ, গদ্য ভাষার জন্মান্তর সাধনের প্রেরণা, যে-প্রেরণা তাঁর নিজেরই মনের নেপথ্যে কাজ করছিলো, তাকে নিঃসংকোচে মুক্তি দেবার পথ পেয়েছিলেন।

একথা বলা প্রয়োজন যে, মনন-চিন্তার বৌদ্ধিক সমাবেশে ‘সবুজপত্র’ স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিল শিক্ষিত বিদগ্ধ জনের পত্রিকারূপে। নবীনদের বেশি জায়গা দিতে পারেনি। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পত্রিকায় রবীন্দ্র পরবর্তী নবীন কবিদের জন্য এটি উপযুক্ত ছিল না।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক নানা ঘাত-প্রতিঘাতে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিকতার ভাঙনের ফলে প্রচলিত মূল্যবোধের বিবর্তন যেভাবে পাশ্চাত্য শিল্প সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রতিফলন বাংলা সাহিত্যেও গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে,সরকারের দমননীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের উত্থান এবং সমাজে নারীর অবস্থান ইত্যাদি প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। সেই সময় বাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে ১৯২৩ সালের ১৫ এপ্রিল (বৈশাখ ১৩৩০) সম্পাদক দীনেশচন্দ্র দাশ ও সহ সম্পাদক গোকুলচন্দ্র নাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ‘কল্লোল’ পত্রিকা। ‘কল্লোল’এর প্রাণপুরুষ অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের ভাষায়-‘‘কল্লোল বললেই বুঝতে পারি সেটা কি। উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা,সমস্ত বাধা-বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্বারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন।’’[৫] রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার সচেতন প্রয়াসে রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যিকদের নতুন ভাবনা ও স্বপ্নের আশ্রয়স্থল ও লীলাক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত হয়েছিল ‘কল্লোল’। আধুনিক মনন নিয়ে দীর্ঘ প্রচলিত সংস্কার, বিশ্বাস এবং নির্দিষ্ট প্রথানুসারী চিন্তা-ভাবনার সম্পূর্ণ বিরোধিতার জন্য কল্লোলে’র লেখকেরা অতি আধুনিক হিসেবে নিন্দিত হলেও; লেখার মধ্যে দিয়ে সমাজের নিম্নবর্গীয় বাস্তবতাকে বার বার তুলে ধরেছেন। কল্লোলের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন-

> ‘‘কল্লোলে যাঁদের লেখা পড়তুম-গোকুলচন্দ্র নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র-নতুন নাম সব, কিন্তু আমার মনে চঞ্চলতা অনুভব করতাম। ‘প্রবাসী’তে যে-লেখাটা বেরোলো সেটা হয়তো বহু পাঠকের চোখে পড়লো, কিন্তু ঐ ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে আমি গেছি হারিয়ে। কিন্তু ‘কল্লোল’ যেন চিনতে পারলো আমাকে, সেই অভিজ্ঞানে আমিও নিজেকে চিনলাম। অর্থাৎ, ‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত হওয়া মানে বিজ্ঞাপন, আর ‘কল্লোলে’ প্রকাশিত হওয়া মানে নিজেকে আবিষ্কার করার আনন্দ।’’[৬]

লেখকদের প্রতি সম্মান ও সহৃদয়তা ‘কল্লোল’এর একটি অন্যতম আকর্ষণ ছিল। সেই সময় যে রচনাগুলি কোন সম্পাদক দ্বারা স্পৃষ্ট হবার সম্ভাবনা ছিলো না ‘কল্লোল’ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ও প্রকাশ করেছে। তবুও ১৯২৬ সালের এপ্রিলে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও মুরলীধর বসুর উদোগে প্রকাশিত হল ‘কালি-কলম’। এদিকে অজিত দত্ত আর বুদ্ধদেব বসুর যৌথ সম্পাদনায় ‘প্রগতি’ (১৯২৭) প্রকাশিত হলো ঢাকা থেকে। ‘প্রগতি’র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন অচিন্ত্যকুমার, জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে। ‘কালি-কলম;এ মোহিতলাল, প্রবোধকুমার সান্যাল ও জগদীশ গুপ্ত। ‘কল্লোল’ ভেঙে তিন ভাগ হলো, কিন্তু ‘কল্লোল’এর মূল লেখকদের তার প্রতি আসক্তি কমলো না তাঁদের অনেকেরই অনেক ভালো লেখা ‘কল্লোল’ই বেরিয়েছে।

‘কল্লোল’ প্রধানত গল্পকেন্দ্রিক পত্রিকা ছিল। তার সমকালকে গল্প, উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে নাগরিক জীবন, বাস্তববাদ, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, শ্রেণিচেতনা ও বিপ্লবী ভাবনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ধারণ করেছিল। কিন্তু যদিও আধুনিক কবিদের কবিতা ‘কল্লোল’এ প্রকাশিত হয়েছিল তবুও এককভাবে আধুনিক কবিতার বিকাশের জন্য যে জায়গা প্রয়োজন সেটা ‘কল্লোল’এ যথেষ্ট ছিল না।

বাংলা সাহিত্যপত্রের ইতিহাসে স্বল্পায়ু হলেও ‘কল্লোল’এর মতনই বিবর্তনকারী পত্রিকা হচ্ছে ‘প্রগতি’। বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত ও অন্যান্য তরুণ লেখক যাঁরা ‘ঢাকাগোষ্ঠী’ নামে পরিচিত তাঁদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম ছিল ‘প্রগতি’। অজিত দত্তের কথায়-

> ‘‘আমরা ঢাকায় ছিলাম, আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। ‘কল্লোল’ আর ‘প্রগতি’র কথা বলতে গিয়ে তাই বুদ্ধদেব বসু বলেছেন- ‘প্রগতি’ পত্রিকাটিকে ‘কল্লোলে’রই একটি টুকরো বলা যায়; এ দুয়ের মধ্যে সংযোগ ও বিনিময় ছিলো নিবিড়।’’[৭]

এই কথার প্রমাণ পত্রিকার দুটির লেখকসূচির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। খ্যাতি-অখ্যাতি,স্তুতি-নিন্দা দুই পেয়েছিল ঢাকার তরুণ সাহিত্যগোষ্ঠীর ‘প্রগতি’। জীবনানন্দ দাশের কবিতা যখন আলোড়ন তুলেছিল সাহিত্য পাঠকের কাছে। তা সত্ত্বেও ‘প্রগতি’র লেখাগুলি ‘শনিবারের চিঠি’র কাছে সমালোচিত হয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রত্যুত্তরও বজায় রেখেছিলেন। তথ্য মতে,

> "প্রথম বছর বারোটি সংখ্যা ...দ্বিতীয় বছরের প্রথম ছমাসের পর সপ্তম ও অষ্টম যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় এরপর আর নতুন সংখ্যা প্রকাশ পায়নি। পরে তৃতীয় বর্ষে প্রথম পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশ সম্ভব হলেও 'প্রগতি' মাত্র দু বছর পাঁচ মাসের আয়ুষ্কাল পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে। আষাঢ় ১৩৩৪ (১৯২৭) থেকে কার্তিক ১৩৩৬ (১৯২৯)।"[৮]

**'প্রগতি'** স্বল্পায়ু হলেও বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। প্রধানত আধুনিক বাংলা কবিতাকে 'প্রগতি' যোগ্য সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। 'প্রগতি'র তরুণ লেখকরা চাইছিলেন নতুন কবিতা, যেখানে থাকবে মুক্তচিন্তা, নতুন ছন্দ, প্রতীকবাদ ও পাশ্চাত্য সাহিত্যচর্চার প্রতিফলন। কবিতায় রোমান্টিকতা ও আবেগকে সংযত করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, নাগরিক জীবন, ও বাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বুদ্ধদেব বসুও লিখেছেন অনেক কবিতা। তাই একথা নি:সন্দহে বলা যায় যে প্রগতি পত্রিকা খুব বেশিদিন না চললেও, পরবর্তী 'কবিতা' পত্রিকার ভিত্তিভূমি তৈরি করেছিল।

'কবিতা' পত্রিকার সূচনা ও সূত্রপাতের ক্ষেত্র আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' (জুলাই ১৯৩১) পত্রিকা। বুদ্ধদেব বসুর মতে-

> "'পরিচয়ে জরুরিতম প্রয়োজন ছিল সুধীন্দ্রনাথেরই নিজের, তাঁর ব্যক্তি স্বরূপের স্ফূর্তির জন্য। এর আগে পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু মহলে আবদ্ধ। সাহিত্য বিষয়েঔৎসুক্য নিয়েও তাঁর নাম আগে শুনিনি।"[৯]

বুদ্ধদেব বসু প্রথম 'পরিচয়' পত্রিকাটি দেখেন এম.এ পরীক্ষার দিনে পায়চারী করা শোভন সরকারের হাতে। সেদিন বিকেলেই ডাকযোগে পত্রিকাটি বুদ্ধদেবের হাতে আসলে তিনি দেখলেন যে, লেখকের মধ্যে এক ধূর্জটিপ্রসাদ ছাড়া বাকি নামগুলো পর্যন্ত অচেনা। তারপর শুক্রবাসরীয় সন্ধ্যায় গিয়েছেন কয়েকবার। কিন্তু 'পরিচয়' এর ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বুদ্ধদেব বসু অনুধাবন করেছিলেন সেটি হচ্ছে, তিনি 'পরিচয়'এর মজলিসে ঠিক মানসিক স্বাচ্ছন্দ পাননি। তাঁর ভাষায় যেন একটু অধিক মাত্রায় সচারু ও সমৃদ্ধ ও শোভমান, যেন আড্ডা নয়, আয়োজিত একটি অধিবেশন- এমনি মনে হয়েছিল আমার। বুদ্ধদেব বুঝেছিলেন তত্ত্বালোচনায় এঁদের যতটা দক্ষতা সাহিত্য রচনায় ততটা নয়- এঁদের মধ্যে লেখক আছেন দুজন মাত্র। সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু এই কথা ও বলেছেন যে-

> "পশ্চিমী মানসের নতুন ধারাটিকে 'পরিচয়' তাদের সামনে তুলে ধরেছিল শুধু সাহিত্যে নয়-- বিজ্ঞান, দর্শন শিল্পকলা সকল ক্ষেত্রে। পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে বাংলা রচনা সম্ভব এই আদর্শের জন্য 'পরিচয়'আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।"[১০]

'পরিচয়' পত্রিকা প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা, বিদেশি সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন, মতাদর্শগত রচনাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। তবে কবিতা একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, বিশেষ করে প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার কবিদের লেখা। কিন্তু কবিতা ছিল গৌণ, কারণ পত্রিকাটি সাহিত্যকে একটি মতাদর্শগত ও চিন্তাগত চর্চার জায়গা হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। ফলে কবিতাকেন্দ্রিক সাহিত্যপত্রের প্রতি যে বাসনা বুদ্ধদেব বসুর, তা অতৃপ্ত থেকে গিয়েছিল। আর সেই বহু প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক মূহুর্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল 'পরিচয়'এর আড্ডাতেই। তাই কবিতা পত্রিকার সূত্রপাতের কথা জানাতে গিয়ে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন-

> "পরিচয়'এর কোনো-এক বৈঠকে অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে একটি পত্রিকা দেখেছিলাম। রোগা চেহারা, ইট-রঙের মলাটের উপর শেলির ছবি ছাপানো, নাম মনে নেই। ভাষা ইংরেজি, জাতি মার্কিন, ভিতরে ছিলো চওড়া মার্জিনে সুন্দর করে সাজানো কবিতা, শুধু কবিতা, আর কবিতারই বিষয়ে কিছু আলোচনা। এই প্রথম আমি কবিতার কোনো পত্রিকা চোখে দেখলুম।"[১১]

'পরিচয়'এর আড্ডা থেকে বুদ্ধদেব বসু সবচেয়ে বড়ো যে সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন, তা হল **'কবিতা'** পত্রিকা প্রকাশের স্বপ্ন। কেননা তাঁর বালক বয়স থেকে পরিণত বয়স অবধি তিনি দেখেছেন পত্রিকাগুলির কবিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য যে-কোন লেখকের পদ্যজাতীয় রচনার কাজ হচ্ছে পাদপূরণ। গদ্য ভোজের

মাঝখানে সংকুচিত হয়ে থাকতে। সামান্যতম জায়গাই তার বিধি নির্দিষ্ট। কিন্তু কবিতাই যে একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য এমনভাব কোথাও নেই। বুদ্ধদেব বসু স্বপ্ন দেখতেন, এমন কোন পত্রিকা হবে যে শুধু মাত্র কবিতার জন্য নিবেদিত। কিন্তু কথাটি কারো কাছে উচ্চারণ করেন নি। সেই স্বপ্নের একটা বাস্তব রূপ মার্কিনি নমুনাটিতে দেখতে পেয়ে ভেবেছেন, বাংলায় এরকম একটি কবিতা বিষয়ক পত্রিকা থাকলে কবিতা এবং কবিরা পদপ্রান্তিক অবমাননা থেকে বেঁচে যাবেন।

বুদ্ধদেব বসু নিজের কল্পনাকে অসম্ভব ভাবলেও সেটাকে মন থেকে বিদায় দিতে পারেননি, মাঝে-মাঝে সেটাকে নিয়ে ভাবতেন। ইতিমধ্যে বুদ্ধদেব বসুর জীবনে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল **১৯** জুলাই, **১৯৩৪** সালে, যখন তিনি গায়িকা ও সাহিত্যিক প্রতিভা বসুকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার এক অনন্য উদাহরণ। বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিভা বসু তাঁকে মানসিক সমর্থন ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, যা তাঁর সৃষ্টিশীলতায় গভীর প্রভাব ফেলেছিল। তাঁদের সম্পর্কের এই দিকটি সুন্দরভাবে উঠে এসেছে প্রতিভা বসুর লেখা ‘জীবনের জলছবি’ গ্রন্থে, যেখানে তিনি তাঁদের জীবনযাত্রা, সাহিত্যচর্চা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের নানা দিক আলোকপাত করেছেন। বুদ্ধদেব বসু যখন তাঁর যোগেশ মিত্র রোডের বাড়িতে এক সান্ধ্য আড্ডায় ‘কবিতা’ পত্রিকা প্রকাশ করার কথা ব্যক্ত করার সঙ্গে অর্থাভাবের কথাটি তুললেন, তখন সহধর্মিনী প্রতিভা বসু তাঁকে সাহস যুগিয়েছেন। কারণ জীবনে অর্থাভাব থাকলেও কোন সৃষ্টিশীল ইচ্ছাকে কখনো থামিয়ে রাখেন নি, মনকে ছোট করেন নি, ‘কবিতা’ পত্রিকা প্রকাশ ভাবনার ক্ষেত্রেও সেই সান্ধ্য আড্ডায় কোনো দুঃখ এসে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, মনকে ছোট করে দেয়নি, হাহুতাশের জন্ম হয়নি, বরং ইচ্ছাকে প্রকাশের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। প্রতিভা বসুর কথায়-

> “চাঁদা তুলে টাকা জোগাড়ের বুদ্ধিটা কার সেটা মনে নেই, তবে প্রথম চাঁদাটা যে আমিই তুলেছিলাম সেটা ভুলিনি। সেই দার্জিলিংয়ের মায়া মাসিমাই দিয়েছিলেন। চাঁদার হার পাঁচ টাকা। বুদ্ধদের পাঁচ টাকা, প্রেমেন্দ্র মিত্র পাঁচ টাকা, মায়া মাসিমা পাঁচ টাকা-পনেরো টাকা তো উঠেই গেল। কী ফূর্তি সকলের। বাড়ি ভেসে গেল সুখের জোয়ারে। সান্ধ্য আড্ডাটা জোরালো হলো। শেষ পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ টাকা চাঁদা উঠতেই শুরু হয়ে গেল কাজ।”[১২]

**১৯৩৫** সালের **১** অক্টোবর বুদ্ধদেবের প্রথম সন্তান (মিমি) আর ‘কবিতা’ পত্রিকা একই দিনে জন্মলাভ করল।
‘কবিতা’ পত্রিকা যেদিন সত্যিকার অর্থে বেরোলো, বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন-

> “কোনো সম্বল বা আয়োজন ছিলো না; দেখা যাক না কী হয়-এই গোছের মনের ভাব নিয়ে আরম্ভ হলো। বিষ্ণু দে, আর একজন অ-কবি বন্ধু, পাঁচ টাকা করে চাঁদা দিলেন, প্রথম দুই সংখ্যা বিনামূল্যে ছেপে দিলেন সদ্যস্থাপিত পূর্বাশা প্রেস। কলকাতার সুধীসমাজে যাঁদের মুখ চিনি বা নাম জানি, এই রকম পনেরো-কুড়ি জনের কাছে প্রথম সংখ্যাটি পাঠিয়ে দিলাম-গ্রাহক হবার অনুরোধ জানিয়ে। সেই অনুরোধ প্রায় সকলেই সম্মানিত করলেন...। সমর সেন নিয়ে গেলেন এসপ্লানেডের স্টলে, তারা বললে এইটুকু কাগজ ছ-আনা দিয়ে কে কিনবে, চার পয়সা দাম হলে ঠিক হতো। দু-দিন পরে আরো কুড়ি কপি পাঠাতে হলো সেখানে-এতে স্টলওলা নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিলো-কিন্তু আমি আরো বেশি।”[১৩]

কিছুটা ভয়ে ভয়ে রবীন্দ্রনাথকেও পাঠিয়েছিলেন ‘কবিতা’ সংখ্যাটি। পত্রটি পাঠিয়ে তিনি ভয় পেয়েছিলেন কেননা-সামান্য কর্তব্যবোধে, দায়সারা গোছের কোন কিছু যদি রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তা না হয়ে তৈরী হল এক স্মরণীয় মূহুর্ত। বুদ্ধদেবের ভাষায়-

> “কিন্তু আমাদের সব দ্বিধা উড়িয়ে দিয়ে দ্রুত এলো তাঁর উত্তর-মস্ত একখানা তুলোট কাগজের এপিঠ-ওপিঠ ভর্তি সেই অনিন্দ্যসুন্দর হস্তাক্ষর, উপরন্তু এলো তাঁর আনকোরা নতুন লম্বা মাপের গদ্য-কবিতা, ‘ছুটি’ (আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি)- তাঁর সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ একটি রচনা।”[১৪]

রবীন্দ্রনাথ ‘কবিতা’ পত্রিকা পড়ে বিশেষ আনন্দের কথা জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন প্রত্যেক রচনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর ভাষায়-

"সাহিত্য-বারোয়ারির দল-বাঁধা লেখার মতো হয় নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্তর্তা নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে।...জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে-এছাড়া অজিতকুমার দত্ত ও প্রণব রায়ের কবিতা পড়ে আমার মন তখনি স্বীকার করেছে তাঁদের কবিত্ব।"[১৫]

এডওয়ার্ড টমসন বিদেশে যিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা করতেন; তাঁকেও বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকা পাঠিয়েছিলেন। কয়েকমাসের মধ্যে 'টাইমস লিট্রেরি সাপ্লিমেন্ট'এ '**Bengal: Land Made For Poetry**' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতার বই 'বীথিকা' 'পরিচয়' 'কবিতা' ও মাদ্রাজের ইংরেজি পত্রিকা নিয়ে দীর্ঘ একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে 'কবিতা' পত্রিকা বিদেশেও অভ্যর্থনা লাভ করল।

'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশে যে যত্ন, যে নিষ্ঠা বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছেন তা অনন্য। তাঁর সমসাময়িক প্রত্যেক কবির উপর লিখেছেন, মনোযোগ ও সময় দিয়েছেন, নিরপেক্ষ হয়ে সমালোচনা করেছেন সম-সাময়িক কবিদের যার দৃষ্টান্ত বিরল।

'কবিতা' ত্রৈমাসিক, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৫ সালের আশ্বিন মাসে। আশ্বিন, পৌষ, চৈত্র ও আষাঢ়-বছরে এই চারটি সংখ্যা বেরুতো। কোনো কোনো বছরে পাঁচটিও বেরিয়েছে (বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক ১৯৪৭), শততম সংখ্যাটি বেরিয়েছে ইংরিজি ও বাংলায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম আছে, সহকারী সম্পাদক সমর সেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে সম্পাদক শুধুই বুদ্ধদেব বসু। ১৯৬১ সালে বুদ্ধদেব বসু আমেরিকায় অধ্যাপনার জন্য চলে গেলে নরেশ গুহ সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। 'কবিতা'র প্রথম বছরে বার্ষিক মূল্য ছয় আনা। প্রথম সংখ্যায় সোনালি-হলুদ প্রচ্ছদে কিউবিস্ট ছাঁদে 'কবিতা' পত্রিকার নাম লেখা। কবিরা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বাগচী। সংখ্যা শুরু হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর 'তামাশা' কবিতা দিয়ে। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতি যে সচেতন ভাবনার ফসল তা সকলেই জানেন। দ্বিতীয় সংখ্যা শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' কবিতা দিয়ে। প্রথম বছরে জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে', 'বনলতা সেন', 'হায় চিল', 'হাওয়ার রাত' সহ দশটি কবিতা, সমর সেনের ষোলোটি। কবিতার একেবারেই প্রথম নিয়ম-ভাঙা প্রকাশ। কোনো কোনো সংখ্যায় পাতার পর পাতা একই কবির কবিতা দেখতে পাই। এটা আর কোনো পত্রিকায় দেখা যায়নি। 'কবিতা' পত্রিকার প্রায় পঞ্চাশ ভাগ লেখাই বুদ্ধদেব বসু-র। সাহিত্যের যে কোনো বিশেষ ঘটনা নিয়ে স্বনামে, বেনামে বুদ্ধদেব লিখেছেন। আর লিখেছেন প্রতিটি প্রধান বাঙালি কবির কবিতার সমালোচনা। কবিদের বৈশিষ্ট্য তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন 'নির্জনতম কবি জীবনানন্দ'। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র।

'কবিতা' পত্রিকার সূচনা থেকেই বুদ্ধদেব বসু আরো একটি বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন, সেটি হচ্ছে কবিতার ভাষা, ছন্দ, কাব্যভাবনার পরীক্ষা নিরীক্ষা মধ্যে দিয়ে সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক কবিতার যোগসূত্র স্থাপন করা। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি জানিয়েছেন-

"'সনে', 'ছিনু', 'মম', 'তব', শব্দ ছেঁটে ফেলতে হবে, আকাশকে 'গগন' বা সূর্যকে 'তপন' বলা কখনোই চলবে না..."[১৭]

প্রগতি'র কাল থেকেই বুদ্ধদেব বসুর মধ্যে একটি অংশ ছিল প্রচারকের তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন। তাই সাহিত্যপত্রের দায়বদ্ধতা নিয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেন-

"শুধু রচনা প্রকাশ করাই পত্রিকার কাজ নয়-সে-রচনা যতই ভালো, যতই নির্বাচিত হোক না। লেখককে প্রকাশ করাও তার কর্তব্য, পরিবর্তনের ধাত্রী এবং আধার হওয়া তার কাজ।"[১৮]

তাই 'কবিতা' পত্রিকার সূচনাপর্ব থেকেই অপর্যাপ্তভাবে প্রকাশিত ও আলোচিত হয়েছেন অনেকেই। রচনায় সামান্যতম দুর্বলতা দেখলে সেটুকুও ধরিয়ে দিয়েছেন। সমালোচনায় সমকালীন প্রতিভাবানদের মৌলিকতা ও গুণকীর্তনে তিনি সর্বদা মুখর থেকেছেন। নানাজনকে দিয়ে লেখাতে চেয়েছেন পছন্দের বই সম্পর্কে। জীবনানন্দ দাশের অধিকাংশ বিখ্যাত কবিতাই ছাপা হয়েছে 'কবিতা'য়। সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসুরও

তাই। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে 'কবিতা'ই চিহ্নিত করেছে। আরো অনেক পরিচিত অপরিচিত কবিদের সসম্মানে গ্রহণ করে বাংলা আধুনিক কবিতা ও কবিতাপত্রের ইতিহাসে 'কবিতা' পত্রিকা শিরোধার্য হয়ে আছে।

'কবিতা' পত্রিকার প্রায় ছাব্বিশ বছরের ইতিহাসে(১৯৩৫-১৯৬১) একশ চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে যুগ্ম সংখ্যা মাত্র চারটি। এছাড়া বিশেষ সংখ্যা তেরটির মধ্যে কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ, রবীন্দ্র সংখ্যা, নজরুল সংখ্যা, জীবনানন্দ সংখ্যা, সুধীন্দ্রনাথ সংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ সংখ্যার তালিকায় তিনটি-মার্কিন সংখ্যা (দ্বিভাষিক), বাংলা কবিতার ইংরেজি অনুবাদ সংখ্যা, এবং শততম সংখ্যা বা আন্তর্জাতিক ইংরেজি-ভাষা সংখ্যাটি 'কবিতা'র সম্পাদকের বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করেছিল। বুদ্ধদেব বসু 'আন্তর্জাতিক সংখ্যা' প্রকাশ করে চেয়েছিলেন বিশ্ব সভায় বাঙালি কবিদের একটা মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে। আবার 'কবিতা'য় প্রকাশিত হয়েছিল কালিদাস রচিত 'মেঘদূত'-এর বঙ্গানুবাদ, যা তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার আর একটি দিক উন্মোচন করেছিল। স্বদেশের পাঠকদের কাছে কবিদের ব্যক্তিগত পরিচিতি সংক্ষেপে তুলে ধরার ব্যবস্থা করেন 'বিংশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা' থেকে। 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রয়াণ লেখাগুলিও অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষত, কবি নন, কিন্তু সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতী মানুষদের স্মরণ করেছেন গভীর সমবেদনার সঙ্গে- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির কুমার ভাদুড়ী, কিংবা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, হিমাংশুকুমার দত্ত বিষয়ে তাঁর শ্রদ্ধা আমাদের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। আর একটা দিকও উল্লেখনীয়, শুধু সম্পাদক হিসাবে তিনি সতর্ক ও বিচক্ষণ ছিলেন তা নয়, মানুষ হিসাবেও তাঁর সহকর্মী কবিদের প্রতি মনোযোগী ও সহমর্মী ছিলেন। প্রভাতকুমার দাশের কথায়-

> "কবি হেমচন্দ্র বাগচীর দীর্ঘদিনের মানসিক পীড়াজনিত অসুস্থতার জন্য 'শেষ রক্ষা' নাটক নিউ এম্পায়াবে মঞ্চস্থ করে অভিনয়লব্ধ আটশত টাকা কবিবন্ধুর চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।"[১৯]

আবির্ভাব মুহূর্তেই 'কবিতা' সকলের মন জয় করে নিতে পেরেছিল সেটা কোনো বহিরঙ্গ আয়োজনের আড়ম্বরে নয়, সর্বাত্মক গুণগত সাফল্যই সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করে যথার্থই লিখেছিলেন:

> "কবিতার প্রথম বছরের চারটি সংখ্যা বাংলায় আধুনিক কাব্য-ইতিহাসে এমন একটি স্বাক্ষর রেখে গেছে যা কোনো দিন মুছবে না। আধুনিক কবিতা যে নিছক একটা মানসিক বিলাস বা খামখেয়ালী বস্তু নয়, সে-কথা এই চারটি সংখ্যা থেকেই বাঙালী পাঠকবর্গ অনুভব করেন।"[২০]

জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ইত্যাদি। এঁদের কবিতা আগে নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু কবির সম্মান তাঁরা পান নি। তাঁদের কবিতা নিয়ে ভালো করে আলোচনাও হয়নি। 'কবিতা' পত্রিকাই প্রথম তাঁদের কবি-সম্মান দেয়, তাঁদের কবিতা নিয়ে নিষ্ঠাভরে আলোচনা করে। একথা শ্রদ্ধার দাবি রাখে যে, নিজে একজন প্রধান কবি হয়েও অন্যান্য কবিদের বিষয়ে আলোচনা, উৎসাহ ও মনোযোগ দিয়েছেন। বুদ্ধদেবের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলা কবিতার অগ্রগতিকে সকলের সামনে তুলে ধরা। বাংলা কবিতা বিষয়ে সামান্যতম অবজ্ঞা, কিংবা উপেক্ষায় অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেতেন।

প্রথমাবধি 'কবিতা' পত্রিকায় আলোচনা ও উদাহরণ দ্বারা বুদ্ধদেব স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন যে পদ্যের আকারে মিলিয়ে লেখা রচনামাত্রকেই কবিতা বলে না। তাই কুড়ি বছর অতিক্রম করে, দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন:

> "আজ ভেবে দেখলে মনে হয়, 'কবিতা' আরম্ভ হয়েছিল পত্রিকারূপে নয়, কবিদের পত্রিকারূপে।...সমকালীন সৎকাব্যের সমগ্র ধারাটিকে আমরা এর মধ্যে সংহত করতে চেয়েছিলাম।"[২১]

একই সম্পাদকীয়তে তিনি 'কবিতা'র বিশ বছরের পরিক্রমায় সার্থকতার দিকটি উল্লেখ করেছিলেন এভাবে:

> "আজকের দিনে যাঁরা পঞ্চাশ-প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত, এবং যাঁরা কুড়ির কিনারায় কম্পমান-তাঁদের এবং তাঁদের মধ্যবর্তী সকলেরই জন্য আমাদের আমন্ত্রণ অবারিত রেখেছি, কনিষ্ঠরাও ইতিমধ্যে

তাঁদের কাব্যচর্চার কিছু প্রমাণ দিয়েছেন। বাংলাদেশে কবিতার প্রচার, মনে হয়, বিবর্ধমান; এই বিষয়টিতে প্রকাশকদের মধ্যে যে-সদ্যগর্ভিণীর অরুচি ছিলো তাও এখন অবসিত বললে ভুল হয় না। তার একটা বড়ো প্রমাণ এই যে গত দু-তিন বছরের মধ্যে তরুণ কবিদের অন্তত পঁচিশখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পেরেছে, তার অনেকগুলো আবার একেবারে প্রথম বই।”[২২]

বাংলা সাহিত্যপত্রের ইতিহাসে ‘কবিতা’ পত্রিকা স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য আর কোনও বাংলা কবিতা পত্রিকারই নেই।

‘কবিতা’ পত্রিকার প্রায় একশো চারটি সংখ্যায় চাব্বিশ বছর ধরে প্রকাশিত বিভিন্ন কবি, সমালোচক ও লেখকদের রচনাগুলি এখন বর্ষানুসারে লিপিবদ্ধ করা হল–

**প্রথম বর্ষ। আশ্বিন,১৩৪২ (প্রথম সংখ্যা)**

| কবি/ লেখক | বিষয় |
|---|---|
| ১) প্রেমেন্দ্র মিত্র | তামাশা (কবিতা) |
| ২) বুদ্ধদেব বসু | চিল্কায় সকাল ( কবিতা) |
| ৩) বুদ্ধদেব বসু | ঘুমের গান (কবিতা) |
| ৪) বুদ্ধদেব বসু | বিরহ (কবিতা) |
| ৫) বিষ্ণু দে | পঞ্চমুখ ( কবিতা) |
| ৬) সমর সেন | Amar Stands Upon (অনুবাদ কবিতা) |
| ৭) সমর সেন | মুক্তি (কবিতা) |
| ৮) সমর সেন | স্মৃতি (কবিতা) |
| ৯) সমর সেন | প্রেম (কবিতা) |
| ১০) সঞ্জয় ভট্টাচার্য | নীলিমা (কবিতা) |
| ১১) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত | জাগরণ (কবিতা) |
| ১২) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত | জন্মান্তর (কবিতা) |
| **কবি/লেখক** | **বিষয়** |
| ১৩) জীবনানন্দ দাশ | মৃত্যুর আগে (কবিতা) |
| ১৪) অজিতকুমার দত্ত | ন খলু ন খলু বাণঃ-(কবিতা) |
| ১৫) প্রণব রায় | আলাপ (কবিতা) |
| ১৬) স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় | প্রচ্ছন্ন (কবিতা) |
| ১৭) হেমচন্দ্র বাগচী | সমাপ্তির সুর (কবিতা) |
| ১৮) বুদ্ধদেব বসু | কবিতায় দুর্বোধ্যতা(সমালোচনা) |

**প্রথম বর্ষ। পৌষ,১৩৪২ (দ্বিতীয় সংখ্যা)**

| কবি/ লেখক | বিষয় |
|---|---|
| ১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ছুটি (কবিতা) |
| ২) বুদ্ধদেব বসু | দয়াময়ী (কবিতা) |
| ৩) সমর সেন | বিস্মৃতি (কবিতা) |
| ৪) সমর সেন | দুঃস্বপ্ন (কবিতা) |
| ৫) সমর সেন | ইতিহাস (কবিতা) |
| ৬) স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় | স্বপ্ন-সিদ্ধি (কবিতা) |
| ৭) স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় | পুরুৎঠাকুর (কবিতা) |
| ৮) জীবনানন্দ দাশ | বনলতা সেন (কবিতা) |
| ৯) জীবনানন্দ দাশ | কুড়ি বছর পর (কবিতা) |
| ১০) জীবনানন্দ দাশ | মৃত মাংস (কবিতা) |

| | |
|---|---|
| ১১) জীবনানন্দ দাশ | ঘাস (কবিতা) |
| **কবি/ লেখক** | **বিষয়** |
| ১২) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত | শেক্সপীয়রের সনেট অবলম্বনে (কবিতা) |
| ১৩) বিষ্ণু দে | প্রথম পার্টি (কবিতা) |
| ১৪) বুদ্ধদেব বসু | আধুনিকতার মোহ (সমালোচনা) |
| ১৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | চিটিপত্র (বুদ্ধদেব বসুকে লেখা) |
| ১৬) বুদ্ধদেব বসু | নতুন কবিতা,বীথিকা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(সমালোচনা) |
| ১৭) বুদ্ধদেব বসু | অর্কেস্ট্রা-সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (সমালোচনা) |
| ১৮) বুদ্ধদেব বসু | সন্ধ্যালোকে-সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (সমালোচনা) |

উপরে শুধুমাত্র কবিতা পত্রিকার প্রথম বর্ষের দুটি সংখ্যা লিপিবদ্ধ করা হলো। এই সংখ্যাগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কবিতার প্রতি বুদ্ধদেব বসুর সততা ও নিষ্ঠা কতটা নিবেদিত। যে আশা নিয়ে তিনি 'কবিতা' পত্রিকার সূচনা করেছিলেন সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন-

> "কবিতার জন্য পরিচ্ছন্ন আর নিভৃত একটু স্থান করে দেবো, যাতে তাকে ক্রমশপ্রকাশ্য উপন্যাসের পদপ্রান্তে বসতে না হয়...তারই জন্য নির্দিষ্ট খেয়ায় সধর্মীর সঙ্গে সসম্মানে সে পৌঁছতে পারে স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে-এইটুকু মাত্র ইচ্ছা করেছিলাম।"[২৩]

বুদ্ধদেব বসু নিজেই 'সসম্মানে' আর 'সুনির্বাচিত' কথাদুটি লক্ষ করতে বলেছিলেন। 'কবিতা'র প্রতিটি সংখ্যাই বাঙালি পাঠককে প্রায় তিন দশক ধরে এই কথাদুটির সামর্থ্য বিশেষভাবে লক্ষ করতে বাধ্য করেছে। কবিতার নির্বাচনে বুদ্ধদেব সবসময়ই সফলতম লেখাটির জন্য উৎসুক থাকতেন। কবিতাকে সম্ভাব্য গন্তব্যে পৌঁছে দেবার মেধাবী ও পরিশ্রমী দায়িত্বটুকুও তিনি সানন্দে পালন করতেন।

১ অক্টোবর ১৯৩৫ সালে 'কবিতা' পত্রিকা আরম্ভ হয়ে সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় মার্চ-এপ্রিল ১৯৬১ সালে। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় 'কবিতা'কে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। পত্রিকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'কবিতা' পত্রিকার তেরো বছর পূর্তির সময়কার সম্পাদকীয় বক্তব্যে। যেখানে পত্রিকার আর্থিক সংকট, পাঠকসংখ্যার হ্রাস, বিজ্ঞাপনের অভাব এবং প্রকাশনার ক্রমবর্ধমান খরচের চাপে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কতটা কঠিন হয়ে পড়েছে, তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই সম্পাদকীয়তে 'কবিতা' পত্রিকার বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রাথমিক মুহূর্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে ধরা যেতে পারে। এখানে বুদ্ধদেব বসু সরাসরি স্বীকার করেছেন যে 'কবিতা'র আয়ের তুলনায় ব্যয় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রতিকূল।পত্রিকার টিকে থাকার জন্য বিজ্ঞাপন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, কিন্তু কলকাতার দাঙ্গা ও ব্যবসামন্দার কারণে বিজ্ঞাপনদাতাদের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। ফলে 'কবিতা'র জন্য নিয়মিত প্রকাশনা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

বুদ্ধদেব বসুর কথায়-

> "কবিতা'র সংসারে অকুলোন ঘটতে-ঘটতে এখন অসম্ভবের কাছাকাছি এসেছে। ১৯৩৮-এর তুলনায় 'কবিতা'র দাম বেড়েছে আড়াইগুণের কিছু বেশি, বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণের কিছু কম, আর খরচ বেড়েছে অন্তত চারগুণ।... এই সংকট আর বেশিদিন সহ্য করতে নিশ্চয়ই সে পারবে না।"[২৬]

উক্ত আবেদন থেকে বোঝা যায়, তখনকার সময়ে নতুন গ্রাহক পাওয়া কতটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেব বসুর এই বক্তব্য শুধুমাত্র 'কবিতা'র সংকটেরই চিত্র নয়, বরং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সাহিত্য পত্রিকার টিকে থাকার সংগ্রামের প্রতিফলনও বটে।

তিন বছর পর আবার আশ্বিন ১৩৫৮ (সেপ্টম্বর-অক্টোবর) ১৯৫১ মাসে সম্পাদকীয়তে বুদ্ধদেব বসু জানালেন আর্থিক অসদ্ভাবের কথা, কবিতা'র প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ার কথা। তবুও বুদ্ধদেব প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন অবস্থাটা সামাল দেবার জন্য। এই সম্পাদকীয়তে জানালেন-

“...কবিতা’র এই আশ্বিন সংখ্যা চৈত্র মাসে বেরোলো। চৈত্র সংখ্যার আর সময় হবে না; এর পরেই আষাঢ় সংখ্যা প্রকাশিত হবে-আশা করছি যথাসময়েই।...এর পর থেকে পত্রিকা প্রকাশ যাতে নিয়মিত হয়, এই সংকল্পসাধনের জন্য আমাদের গ্রাহক এবং পাঠকদের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি।”[২৮]

কালের প্রবাহে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি সাহিত্যের নির্মাণভাবনা, শৈলীতেও তার স্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। ‘কবিতা’ পত্রিকা বাংলা কবিতাকে সুদীর্ঘ বছর লালন করলেও ১৯৫০-এর পরবর্তী বংলাসাহিত্যের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে শুরু করে। সে সময়ের যুগধর্ম রক্ষার্থে ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় তরুণ কবিদের মুখপাত্র ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা। ‘কবিতা’ পত্রিকা যেহেতু অবিভাবকসুলভ তাই এতে কবিতা প্রকাশের সৌভাগ্যকে তরুণ কবিরা শ্রদ্ধাভরে গ্রহন করেছেন।

চৈত্র ১৩৬৭(মার্চ-এপ্রিল ১৯৬১) সংখ্যাই যে ‘কবিতা’ সর্বশেষ সংখ্যা হবে সেটা কেউ ভাবেননি। কারণ পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যার মতো এই সংখ্যাতেও গ্রাহক হবার নিয়মাবলী, ঠিকানা বদল হলে সঙ্গে সঙ্গে তা জানাবার অনুরোধ ইত্যাদি সংবলিত বিজ্ঞপ্তিটিও বেড়িয়েছিল। তবুও ‘কবিতা’র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেল। ‘বুদ্ধদেব বসুর জীবন’ গ্রন্থে সমীর সেনগুপ্ত জানিয়েছেন- কবিতা বন্ধ হয়ে যাবার জন্য আক্ষেপ তরুণ কবিদের অন্যতম ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকায় ধ্বনিত হল প্রায় দু-বছর পরে- চৈত্র ১৩৬৯( মার্চ-এপ্রিল ১৯৬৩) সংখ্যায়-

“...প্রথম লিখতে আরম্ভ করার সময় আমরা ভাবতুম যদি কখনো ‘কবিতা’ পত্রিকায় আমার রচনা ওঠে, তবে জীবন ধন্য হবে।... এখন যারা কবিতা লিখতে শুরু করবেন- তাঁদের জন্য এ স্বর্গ রইল না। তাঁরা কোন কাগজে নিজের লেখা দেখে জীবন ধন্য করবেন কোনো কাগজ নেই আর।...”[২৯]

‘কবিতা’ হঠাৎ বন্ধ করে দিলেন কেন? এরকম একটি জরুরী প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ‘অন্যমন’ নামক ছোট পত্রিকার ১৩৭৬ (১৯৬৯ খৃ.) শরৎকালীন সংখ্যায় বুদ্ধদেব একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন পত্রিকা বন্ধ করে দেবার অন্তর্নির্হিত কারণ-

“...কয়েক বছর আগে অনেকটা স্বল্প ব্যবধানে আমাকে দু-দুবার বিদেশে যেতে হ’লো এবং সেই সময়েই ‘কবিতা’ এত অনিয়মিত হ’য়ে পড়লো...একেবারে আসল কারণ বোধহয় এই যে আমি নিজেই পত্রিকা পরিচালনায় ক্লান্ত হ’য়ে পড়েছিলাম; নিজের জন্য, নিজের লেখার জন্য আরও বেশি সময় চাচ্ছিলাম। পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনের কাজ। যৌবন পেরিয়ে এসে তা না করাই উচিত।”[৩০]

‘সাহিত্যপত্র’এর স্বধর্ম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বুদ্ধদেব নিজেই বলেছিলেন-

“স্বল্পায়ুতাই এদের চরিত্র লক্ষণ। বিশেষ-কোনো সময়ে, বিশেষ-কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর উদ্যমে, বিশেষ কোনো একটি কাজ নিয়ে সঞ্জাত হয়, এবং সেটুকু সম্পন্ন হলেই এদের তিরোধান ঘটে। সেটাই শোভন, সেটাই যথোচিত।”[৩১]

‘কবিতা’ পত্রিকা শুধু একটি সাহিত্যপত্র ছিল না, এটি ছিল বাংলা কবিতার এক নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন। নানা সংকট ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও এই পত্রিকা আধুনিক বাংলা কবিতার বিকাশে যে ভূমিকা রেখেছে, তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। নতুন কবিদের জন্য যেমন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে গভীর সাহিত্যচিন্তা ও উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে। বুদ্ধদেব বসুর নেতৃত্বে ‘কবিতা’ হয়ে উঠেছিল এক সৃজনশীল মঞ্চ, যেখানে নবীন-প্রবীণ কবিরা মিলে বাংলা কবিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। ‘কবিতা’ শুধুমাত্র কবিতা চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করেনি, বরং আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষা, কাঠামো ও বিষয়বস্তুতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। নবীন কবিদের জন্য এটি ছিল আশ্রয়, যেখানে তারা তাদের নিজস্ব কণ্ঠকে প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। প্রবীণ কবিরাও তাঁদের সৃজনশীলতার নতুন দিক উন্মোচনের ক্ষেত্র হিসেবে । ফলে এটি হয়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্র, যা কবিতার পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাকেও প্রভাবিত করেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই ‘কবিতা’ পত্রিকার অবদান অবিস্মরণীয়ভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

**তথ্যসূত্র:**

১) দেব, হারীতকৃষ্ণ, সবুজ পাতার ডাক,আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ মিঃ, কলকাতা ৭০০০০৯, ১৯৯৭, পৃ.৩০
২) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪১
৩) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪২
৪) তদেব, পৃ.৩৪২
৫) সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার, কল্লোল যুগ, ডি.এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬, আষাঢ় ১৩৫৮, পৃ.৩০
৬) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪৩
৭) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-১ ‘আমার যৌবন’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২২, পৃ.৭৯
৮) দত্ত, সন্দীপ, বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিবৃত্ত ১৯০০-১৯৫০, গাঙচিল, কলকাতা ৭০০১১১, জানুয়ারী ২০১৬, পৃ.৭৮
৯) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪৫
১০) তদে্ব, পৃ.৩৪৫
১১) তদেব, পৃ.৩৪৬
১২) বসু, প্রতিভা, জীবনের জলছবি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০২০, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ.১১৮
১৩) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-১ ‘আমার যৌবন’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২২, পৃ.১৩৪
১৪) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-১ ‘আমার যৌবন’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২২, পৃ.১৩৭
১৫) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪২
১৬) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘কবিতা ও আমার জীবন’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৬৩২
১৭) তদেব, পৃ.৬২৩
১৮) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৪১
১৯) বসুরায়, শেখর, বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০২৭, মে ১৯৯৯, পৃ. ২৫৪
২০) বসুরায়, শেখর, বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০২৭, মে ১৯৯৯, পৃ. ২৫০
২১) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘কবিতার কুড়ি বছর’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.১৩৩
২২) তদেব, পৃ.১৩৪
২৩) তদেব,পৃ.১৩২
২৪) বসু, প্রতিভা, জীবনের জলছবি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০২০, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ.১৫১
২৫) বসুরায়, শেখর, বৈদগ্ধ্য, বুদ্ধদেব বসু সংখ্যা, দীপ প্রকাশন, কলকাতা ৭০০০২৭, মে ১৯৯৯, পৃ. ২৫৮
২৬) কবিতা পত্রিকা, ত্রয়োদশ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা-আষাঢ়,সম্পাদকীয়, পৃ.১২৬
২৭) কবিতা পত্রিকা, ষষ্ঠদশ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা-১৩৫৪, সম্পাদকীয়, পৃ.১৮১
২৮) সেনগুপ্ত, সমীর, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, জানুয়ারী ২০১৯, পৃ.৩১৭
২৯) সেনগুপ্ত, সমীর, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, প্রতিভাস, কলকাতা ৭০০০০২, জানুয়ারী ২০১৯, পৃ.৩১৭
৩০) বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সমগ্র-৪ ‘সাহিত্যপত্র’, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ৭০০০২০, জানুয়ারী ২০২০, পৃ.৩৫০